প্রথম অধ্যায় : পরিবেশের জন্য ভাবনা

বায়ুমন্ডল

পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বায়ুর আবরণকে বায়ুমণ্ডল বলে। বায়ুমন্ডলের উচ্চতার সীমা নির্ধারণ করা কার্যত অসম্ভব, কারণ যে কোনো গ্যাসীয় পদার্থ আশেপাশের সব জায়গায় বিচরণ করে অর্থাৎ প্রসারিত। উচ্চতার সাথে বায়ুর ঘনত্ব ব্যাস্তানুপাতিক; অর্থাৎ উচ্চতা যত বাড়তে থাকে, বায়ুর ঘনত্ব তত কমতে থাকে। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে ভূপৃষ্ঠের 750 কিলোমিটার থেকে এক হাজার কিলোমিটারের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক।

বায়ুমণ্ডলের গঠন প্রণালী : বায়ুমন্ডলের গঠনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে -

- বায়ুমণ্ডলের উপাদান
- বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

বায়ুমণ্ডলের উপাদান সমূহ : মূলত তিন ধরনের উপাদান দিয়ে বায়ুমণ্ডল গঠিত; যথা - ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প এবং গ্যাসীয় উপাদান। যেমন- নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস।

বায়ুমণ্ডলের স্তর বিভাজন

রাসায়নিক গঠনের নিরিখে বায়ুমন্ডলের স্তরবিন্যাস :

রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে বায়ুস্তর মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত, হোমোস্ফিয়ার ও হেটেরোস্ফিয়ার।

- **হোমোস্ফিয়ার :** ভূপৃষ্ঠের উপরিতল থেকে 80 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত, সমসত্ব বায়ুস্তরকে সমমন্ডল অথবা হোমোস্ফিয়ার বলে। এই বায়ুস্তরে, ওজন গ্যাস ও জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয়।
- **হেটেরোস্ফিয়ার :** ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০ কিলোমিটারের উপরে, যে বায়ুস্তর বিদ্যমান, তাতে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন গ্যাস অবস্থান করে। যেমন- অক্সিজেন,

হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। বায়ুমণ্ডলের এই বিশেষ উচ্চস্তরই হলো বিষমন্ডল অথবা হেটেরোস্ফিয়ার।

উষ্ণতার নিরিখে বায়ুমন্ডলের স্তরবিন্যাস :

উচ্চতার পরিবর্তনের সাথে সাথে, বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের নিরিখে বায়ুমণ্ডলকে বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত করা হয়।

ট্রপোস্ফিয়ার :

- বায়ুমণ্ডলের এই স্তরটি ভূপৃষ্ঠের সবথেকে কাছে অবস্থিত। পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে প্রায় 17 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত, এই স্তরটি বিদ্যমান।
- এই বায়ু স্তরে, প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে 6.5°C, তাপমাত্রার হ্রাস ঘটে।
- যেহেতু, এই বায়ুস্তরে তাপমাত্রা পরিবর্তনশীল, তাই মেঘ, ধূলিকণা, বায়ুর পরিচলন স্রোত, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি এই স্তরেই দেখা যায়। তাই এই বায়ুস্তরকে ক্ষুব্ধমণ্ডল বলে।
- এই বায়ুস্তরে, ধূলিকণার থাকার কারণে আকাশ নীল রঙের দেখায়।
- ট্রপোস্ফিয়ারে উষ্ণতা 15°C থেকে -55°C-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
- ট্রপোপজ হলো এই বায়ুস্তরের উপরিভাগের সীমানা। পৃথিবীর বিষুবরেখায়, ট্রপোপজের উচ্চতা থাকে 15-16 কিলোমিটার। এই উচ্চতাই ৫-৬ কিলোমিটার পরিণত হয় উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে।
- যেহেতু মেরু অঞ্চলে বায়ু সংকুচিত অবস্থায় অবস্থান করে তাই ওই অঞ্চলের উষ্ণতা গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি পায় এবং শীতকালে হ্রাস ঘটে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ার :

- স্ট্রাটোস্ফিয়ার হলো ট্রপোস্ফিয়ারের ঠিক উপরিভাগের বায়ুস্তর। এই বায়ুস্তরটির উচ্চতা, 10-50 কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- এই স্তরে, উচ্চতা এবং তাপমাত্রার মধ্যে *সমানুপাতিক* সম্পর্ক; অর্থাৎ উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং উচ্চতার হ্রাস হলে তাপমাত্রারও হ্রাস ঘটে। এই অঞ্চলটির সীমানা বরাবর *স্ট্রাটোপজ* অবস্থিত।
- এই অঞ্চলের তাপমাত্রা সাধারণ 0° সেলসিয়াস অথবা 32° ফারেনহাইট থাকে।

- পরিচলন স্রোত, এই অঞ্চলে সৃষ্টি হয় না এবং এখানে মেঘ, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি অনুপস্থিত, বিশেষত এই কারণটির জন্যই এই অঞ্চলটির আরেক নাম, *'শান্ত মন্ডল'*।

মেসোস্ফিয়ার :

- স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উপরিভাগ হলো মেসোস্ফিয়ার এবং এই স্তরটি 50-80 কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তীর্ণ, উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মেসোস্ফিয়ারে তাপমাত্রার হ্রাস ঘটতে দেখা যায়।
- তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় -95°C বা -139°F। এই স্তরের ওপরের সীমানাকে মেসোপজ বলা হয়।

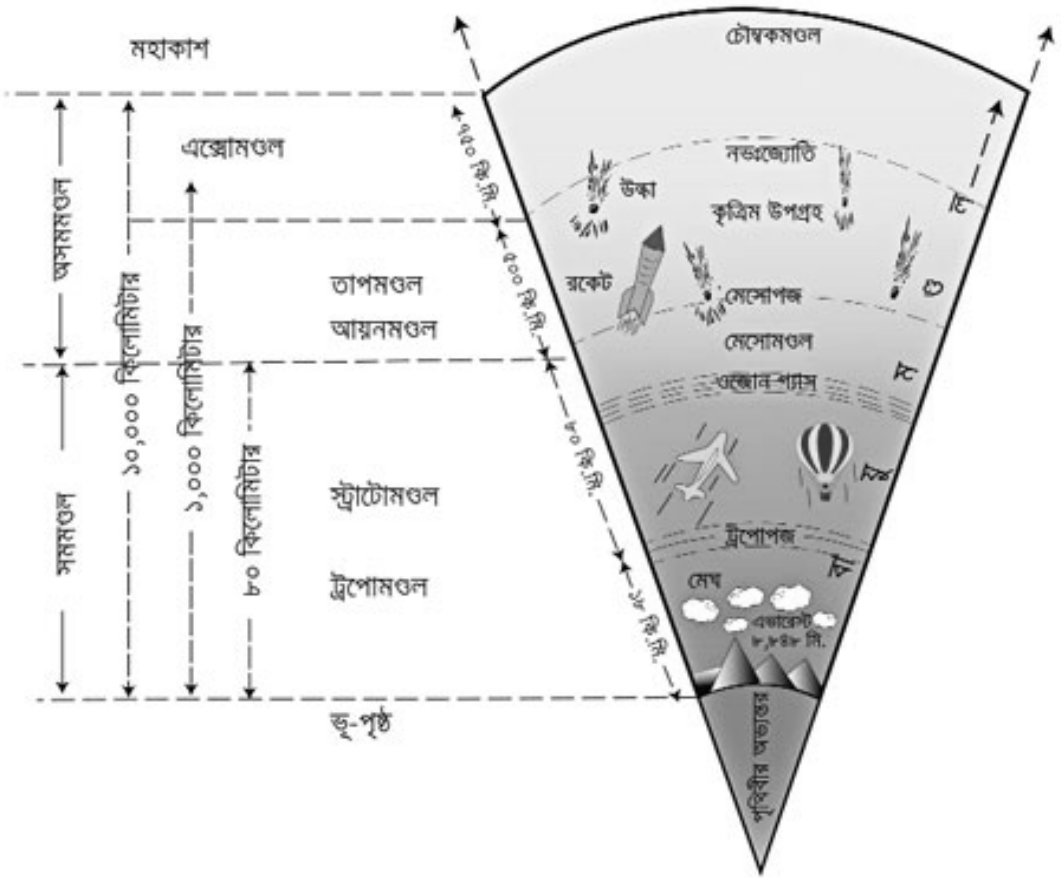

চিত্র: বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

থার্মোস্ফিয়ার :

- মেসোপজের ঠিক উপরিভাগে থার্মোস্ফিয়ার অবস্থিত এবং এই স্তরটি 85-450 কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত।
- এই স্তরে, প্রথমে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রারও দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে; এবং ধীরে ধীরে এই উষ্ণতা বৃদ্ধির হার কম হয়। থার্মোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা 1200°C পর্যন্তও পৌঁছতে পারে।

এক্সোস্ফিয়ার :

এই স্তরটি 500-600 কিমি উচ্চতাবিশিষ্ট। কম ঘনত্ববিশিষ্ট গ্যাস থাকে এবং এই স্তরের উষ্ণতা 1240°C।

1. অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে ভূপৃষ্ঠকে রক্ষা করাই হলো এই বায়ুস্তরের মুখ্য কাজ।
2. ওজনোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা সাধারণত 76°C হয়।

আয়োনোস্ফিয়ার : এই বিশেষ বায়ুস্তরটি মেসোস্ফিয়ারের উপরের অংশ থেকে শুরু করে থার্মোস্ফিয়ারের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত।

1. এই বায়ুস্তরটি বেতার সংযোগে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।
2. বায়ুমণ্ডলের এই অংশেই মেরুজ্যোতি বা অরোরা দেখা যায়।
3. আয়োনোস্ফিয়ারে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থ, আয়নিত অবস্থায় বিচরণ করে।

ম্যাগনেটোস্ফিয়ার : ভূপৃষ্ঠ থেকে 1330-64000 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত এই বায়ুস্তরে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। এই স্তরে 'ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়' রয়েছে।

বিভিন্ন বায়ুস্তরে উচ্চতার নিরিখে উষ্ণতার তারতম্য

- **ট্রপোস্ফিয়ার :** এই বায়ুস্তরের উচ্চতা 10-16 কিলোমিটার পর্যন্ত এবং উষ্ণতা -55°C পর্যন্ত নামে।

- **স্ট্রাটোস্ফিয়ার ও ওজনোস্ফিয়ার :** 50 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত স্ট্রাটোস্ফিয়ার বিস্তৃত। 0°C হল স্ট্রাটোপজের তাপমাত্রা। ওজোনস্ফিয়ারের দিকে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রায় 76°C পরিণত হয়।
- **মেসোস্ফিয়ার :** 50-80 কিলোমিটার উচ্চতাবিশিষ্ট এই বায়ুস্তরের তাপমাত্রা নেমে প্রায় -95°C হয়।
- **থার্মোস্ফিয়ার :** এই বায়ুস্তরটির উচ্চতা 450 কিলোমিটার এবং এই অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রায় 1200°C পৌঁছায়।

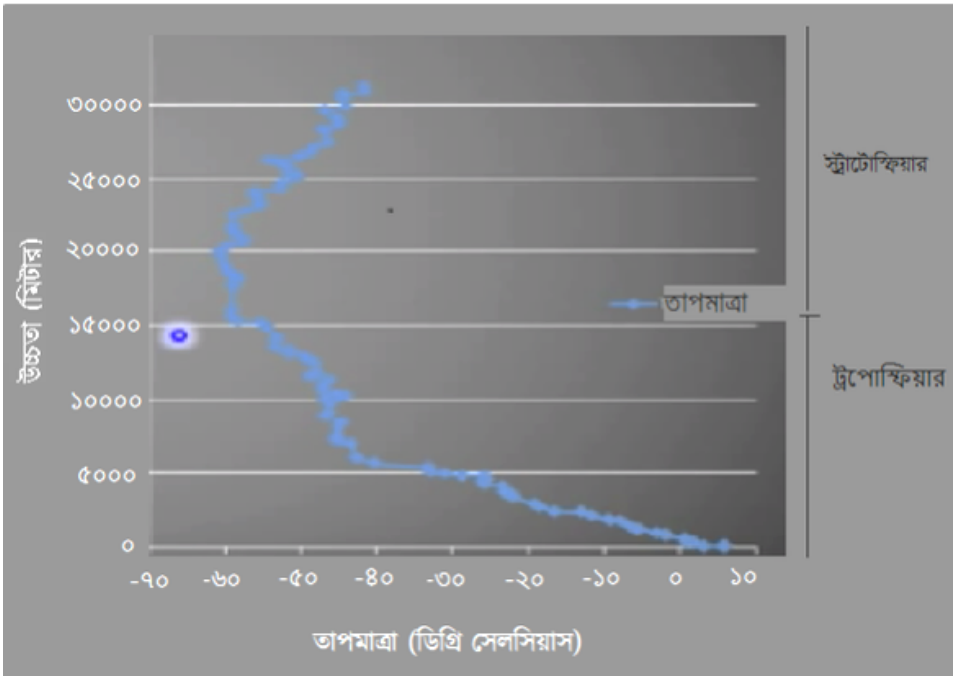

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন বায়ুস্তরের মধ্যে উচ্চতার পরিবর্তনে, চাপের পরিবর্তন

পৃথিবীর উপরিভাগে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ থাকে সাধারণত 1.013।

[একক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ = 76 সেমি পারদস্তম্বের চাপ = $1.013 \times 10^5 Pa$।

10^{-1} বায়ুমণ্ডলীয় চাপ থাকে ট্রপোপজে অর্থাৎ 20 km উচ্চতায়।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারে অর্থাৎ 40 কিলোমিটার উচ্চতায়, এই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ গিয়ে দাঁড়ায় 10^{-3} তে।

মেসোস্ফিয়ারে এই চাপ হয়10^{-4}বায়ুমন্ডলীয় চাপ। মেসোপজে অর্থাৎ 80

কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুমন্ডলীয় চাপ সাধারণত হয়ে থাকে 10^{-5}। 10^{-6} বায়ুমন্ডলীয় চাপ হল থার্মোস্ফিয়ারে বায়ুর চাপ। ভূপৃষ্ঠ থেকে 250 কিলোমিটার উচ্চতা আরোহন করার পর যে কোনো ব্যক্তি 10^{-9} বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অনুভব করে থাকে। 350 কিলোমিটার, ৪৫০ কিলোমিটার এবং 1000 কিলোমিটারউচ্চতায় চাপের মান হয় 10^{-10}, 10^{-11}, 10^{-12} বায়ুমণ্ডলীয় চাপ।

প্রচলন স্রোত এবং ঝড়-বৃষ্টি

1. বায়ু, ধোঁয়া, জলীয় বাষ্প, জৈব পদার্থ ইত্যাদি এরোসল ট্রপোস্ফিয়ার স্তরে অবস্থান করে এবং এই স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাস হয়।
2. উষ্ণ বায়ু হালকা হওয়ায় ওপরের দিকে অগ্রসর হয় এবং ট্রপোস্ফিয়ার অঞ্চলে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি করে।
3. এই উষ্ণ-আর্দ্র বায়ু যখন শীতল বায়ুর মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয় তখন কিউমুলোনিম্বাস মেঘ তৈরি করে। এই বায়ু আরো ওপরের দিকে উঠতে থাকে লীন তাপের দ্বারা, যা জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে উৎপন্ন হয়।
4. এই ঘনীভবনের ফলেই তৈরি হয় জলকণা এবং তা মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসে এবং বাষ্পীভবনের মাধ্যমে ওপরের দিকে পুনরায় অগ্রসর হয়।
5. এইসকল জলবিন্দু অর্থাৎ বৃষ্টির কণাগুলির মধ্যে ঘর্ষণের ফলে ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।
6. উপরে উঠে এই বায়ু যখন শান্ত শীতল হয়ে পড়ে তখন বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের আবির্ভাব ঘটে। এই বৃষ্টি পরিচলন বৃষ্টি নামে পরিচিত।

ওজোন স্তর

ওজোন গ্যাসকে মূলত ভূপৃষ্ঠ থেকে 40-45 কিলোমিটার উচ্চতায় অর্থাৎ স্ট্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরটির অপর নাম ওজোনোস্পিয়ার।

ওজোন স্তরের উৎপত্তি : সূর্য থেকে নিঃসৃত অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করাই হল ওজোন স্তরের মূল লক্ষ্য। এই বায়ুস্তর অতিবেগুনি রশ্মির মধ্যে অবস্থিত অক্সিজেন অণুকে বিভাজিত করে পরমাণুতে পরিণত করে। একটি অক্সিজেন অণুর (O_2) সাথে যখন অক্সিজেন পরমাণু (O) সংযুক্ত হয়, তখনই ওজন অণুর (O_3) উৎপত্তি ঘটে। এই ওজন অণুর সাথে অক্সিজেন অণুর বিক্রিয়াচক্রটি সর্বক্ষণ চলতেই থাকে এবং এই বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন ওজোন অণুগুলিই মূলত অতিবেগুনিরশ্মিকে শোষণ করে নেয়; যার ফলে এই বায়ুস্তরের উষ্ণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

$O_2 +$ অতিবেগুনিরশ্মি $= 2O$, $O + O_2 = O_3$, $O_3 +$ অতিবেগুনি রশ্মি $= O_2 + O$

ওজোনস্তরের বিপত্তি : ওজোনস্তর মনুষ্যজাতিকে প্রতিনিয়ত অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। বায়ুস্তরটি বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর পিছনে রয়েছে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, নাইট্রাস অক্সাইড এবং অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস। এই সকল গ্যাসের দ্বারা সুমেরু এবং কুমেরু অঞ্চলের ওজোন স্তরে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গহ্বর।

ওজোনস্তরের ধ্বংসের ক্ষতিকারক প্রভাব : বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা ওজোন স্তর বিভিন্ন রুপে ধ্বংসান্নিত হয়ে চলেছে। এর ফলস্বরূপ ওজোন স্তরের মোট আয়তনের 4% এখনো পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলত বেশি পরিমাণে ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে যা মনুষ্যজাতি তথা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ-এর ওপর অতিরিক্ত আঘাত আনছে।

- গাছপালা বিপুল হারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- জলে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবসংখ্যার ক্রমাগত হ্রাস ঘটছে।
- বেশি পরিমাণে অতিবেগুনি রশ্মি খুব সহজেই পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

- মানুষ থেকে শুরু করে জীবজন্তুর ত্বক এবং চোখে বিভিন্ন মারণ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং গ্রিনহাউস এফেক্ট

সূর্য থেকে নিঃসৃত ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তাপীয় বিকিরণ খুব সহজেই গ্রীনহাউসের অভেদ্য কাঁচ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করে কিন্তু, গ্রীনহাউসের ভিতরে অবস্থিত উদ্ভিদ এবং গ্রীন হাউসের মেঝে থেকে সৃষ্ট ইনফ্রারেড সাধারণত বড় তরঙ্গ যুক্ত হয়ে থাকে, তা ওই অভেদ্য বিকিরণ ভেদ করে বাইরে নির্গত হতে অক্ষম। ফলত গ্রীন হাউসের ভেতর সৃষ্টি হয় প্রবল উষ্ণতা।

ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করে সূর্য থেকে নির্গত ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তাপীয় বিকিরণ, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, পৃথিবীপৃষ্ঠেকে প্রচন্ড রূপে উত্তপ্ত করে তোলে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিত ইনফ্রারেড রশ্মি বায়ুমণ্ডলের নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন অথবা জলীয়বাষ্প দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে। এইসকল গ্যাস সমূহই মূলত গ্রীন হাউস গ্যাস নামে পরিচিত।

এই সকল গ্যাস ভূপৃষ্ঠের দিকেও তাপীয় বিকিরণ করে থাকে। ফলস্বরূপ, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। কার্বন-ডাইঅক্সাইডকেই মূলত মুখ্য গ্রীনহাউস গ্যাস হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তুলনায় ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের তাপ শোষণ ক্ষমতা অনেকগুন বেশি।

মনুষ্যজাতির কিছু বিশেষ কাজের ফলস্বরূপ এই সকল গ্যাসের উৎপত্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে যার ফলে বেড়ে চলেছে পৃথিবীর উষ্ণতা। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির এই ঘটনাকে *গ্লোবালওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ণ* বলে।